যুলহজ্জের দশ দিনের মাহাত্ম্য

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين .. وبعد :

মহান আল্লাহর একটি মহা অনুগ্রহ এই যে, তিনি নিজ নেক বান্দাগণের জন্য বিভিন্ন মৌসম সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা নেক আমল বৃদ্ধি করে নিতে পারে। সেই সব মৌসমের অন্যতম হল, যুলহজ্জের দশ দিন।

এই মৌসমের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহতে অনেকানেক দলীল বর্ণিত হয়েছে। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

"শপথ ফজরের। শপথ দশ রাত্রির।" (ফাজ্‌র ঃ ১-২)

ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ থেকে উদ্দিষ্ট যুলহজ্জের ১০টি দিন; এ কথা বলেছেন ইবনে আব্বাস, ইবনুয যুবাইর, মুজাহিদ প্রমুখগণ।

২। "এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।" (সাহাবাগণ) বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। *(বুখারী ৯৬৯, আবূ দাউদ ২৪৪০নং)*

৩। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ)

"বিদিত দিনগুলিতে আল্লাহর নামের যিক্‌র করতে পারে।" (হাজ্জ ঃ ২৮)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, এ (বিদিত দিনগুলি) হল (যুলহজ্জের) দশ দিন। (তফসীর ইবনে কাষীর)

৪। ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই দশ দিনের চাইতে আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট অধিক মহান ও পছন্দনীয় কোন দিন নেই, যার মধ্যে নেক আমল করা যেতে পারে। অতএব তাতে তোমরা বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়।" (আহমাদ ৫৪৪৬, ৬১৫৪নং, যয়ীফ)

৫। পূর্বোক্ত ইবনে আব্বাসের হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ বিন জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) যিলহজ্জ মাস প্রবেশ করলে তিনি এত পরিশ্রম করতেন যে, পরিশেষে তাঁর সামর্থ্যের বাইরে চলে যেত। (দারেমী ১৭৭৪নং)

৬। ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যিলহজ্জের দশ দিন শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ রূপে স্পষ্টতঃ যা মনে হয়, তা এই যে, তা হল নামায, রোযা, সাদকাহ ও হজ্জের মতো প্রধান প্রধান ইবাদতসমূহের সমবেত-স্থল। এমন সমাবেশ অন্য কোন দিনে ঘটে না।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯০)

এই দিনগুলিকে কী করা কর্তব্য?

১। নামায ঃ সকাল সকাল ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়া এবং বেশি বেশি নফল পড়া মুস্তাহাব। যেহেতু তা হল নৈকট্যদাতা শ্রেষ্ঠ আমলসমূহের অন্যতম। সওবান ﷺ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।" *(মুসলিম ১১২১নং তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

অবশ্য এ মাহাত্ম্য সকল সময়ের জন্য ব্যাপক।

২। রোযা ঃ যেহেতু এটি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত।

হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "নবী ﷺ যুল হজ্জের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" *(আহমাদ, সহীহ আবূ দাউদ ২১২৯নং, নাসাঈ)*

উক্ত নয় দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, 'ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা পাকা মুস্তাহাব।' *(শারহুন নাওয়াবী ৮/৩২০)*

৩। তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পাঠ ঃ যেহেতু পূর্বোক্ত ইবনে উমারের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "তাতে তোমরা বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়।"

ইবনে উমার ﷺ এবং আবূ হুরাইরা ﷺ এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে) তকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তকবীরের সাথে তকবীর পাঠ করত। *(বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৫৩১)*

উমার ﷺ মিনায় নিজ তাঁবুতে তকবীর পড়তেন। মসজিদের মুসল্লীরা তা শুনতে পেত ফলে তারাও তকবীর পড়ত এবং বাজারের লোকেরাও তকবীর পড়ত। পরিশেষে তকবীরের শব্দে মিনা মুখরিত হতো। (বুখারী ৯৭০ নম্বরের পূর্বে)

ঐ দিনগুলিতে ইবনে উমার ﷺ মিনায় তকবীর পাঠ করতেন। তিনি ফরয নামাযের পশ্চাতে, বিছানায় বসে, তাঁবুতে বসে, মজলিসে ও পথ চলতে তকবীর পড়তেন।

মুস্তাহাব হল উচ্চ স্বরে তকবীর পড়া। যেহেতু উমার, ইবনে উমার ও আবূ হুরাইরা ﷺ উচ্চ স্বরে পড়তেন।

আমাদের উচিত, এই সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করা, যা বর্তমান যুগে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে এবং বিস্মৃত হয়ে পড়েছে, এমনকি---আফসোসের কথা---ভালো লোকদের নিকটেও; যা সলফে সালেহীনদের প্রতিকূল আমল।

তকবীরের শব্দাবলী ঃ

(ক) 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা।'

(খ) 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।'

(গ) 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লা-হু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।'

৪। আরাফাতের রোযা ঃ এ দিনগুলির মধ্যে আরাফাতের দিন রোযা রাখা অধিক তাকীদপ্রাপ্ত। যেহেতু মহানবী ﷺ এই রোযা সম্পর্কে বলেছেন, "আরাফার দিন রোযা অতীত এক বছর ও আগামী এক বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।" *(মুসলিম ২৮০৩নং)*

অবশ্য যিনি আরাফাতে হজ্জের ইহরামে থাকবেন, তিনি ঐ রোযা রাখবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ ঐ দিনে রোযা না রেখে আরাফাতে অবস্থান করেছেন।

৫। কুরবানী করা ঃ

কুরবানীর দিনের ফযীলত ঃ এটি এমন একটি মহান দিন, যে দিনের ব্যাপারে বহু মুসলিম বেখবর। এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের ব্যাপারে বহু মু'মিন উদাসীন। অথচ কিছু উলামা মনে করেন যে, সাধারণভাবে এই দিন হল বছরের সমস্ত দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এমনকি আরাফাতের দিন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন কুরবানীর দিন। এই দিনই হল (কুরআনে উল্লিখিত) 'হজ্জে আকবার'-এর দিন। যেমন হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহান দিন কুরবানীর দিন। তারপর অবস্থানের দিন।" (আবূ দাউদ ১৭৬৭নং) অবস্থানের দিন মানে মিনায় অবস্থানের দিন যুলহজ্জের ১১ তারীখ।

বলা হয়েছে যে, আরাফাতের দিন ঐ দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। কেননা, তার রোযা দুই বছরের গোনাহ মোচন করে দেয়। আরাফাতের দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই, যেদিন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জাহান্নামীদেরকে মুক্ত করে থাকেন। আর যেহেতু এই দিনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বান্দাগণের নিকটবর্তী হন। অতঃপর আরাফাতবাসীদেরকে নিয়ে ফিরিশ্‌তাবর্গের নিকট গর্ব করে থাকেন।

কিন্তু সঠিক কথা হল প্রথমটি। যেহেতু হাদীসে সে কথার দলীল রয়েছে, যার কোন কিছু বিরোধী হতে পারে না। (যাদুল মাআদ ১/৫৪)

মোট কথা কুরবানীর দিন সর্বশ্রেষ্ঠ হোক অথবা আরাফার দিন, হাজী অথবা অহাজী মুসলিমের উচিত, তার মাহাত্ম্য অর্জন করা এবং তার জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

কল্যাণের মৌসমকে কী দিয়ে স্বাগত জানাব?

১। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, সাধারণভাবে কল্যাণের সকল শ্রেণীর মৌসমকে স্বাগত জানানো, বিশুদ্ধ তওবার মাধ্যমে, পাপ ও অবাধ্যাচরণ বর্জনের মাধ্যমে। যেহেতু পাপ-পঙ্কিলতাই মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখে এবং তার হৃদয়কে আপন মাওলা থেকে বাধাপ্রাপ্ত করে।

২। অনুরূপভাবে সাধারণভাবে কল্যাণের সকল শ্রেণীর মৌসমকে স্বাগত জানানো উচিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন কিছু করার সুযোগ নেওয়ার সত্য সংকল্প নিয়ে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হয়, আল্লাহ তাকে তার বিনিময় দেন। তিনি বলেছেন,

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব।" (আনকাবূত ঃ ৬৯)

সুতরাং ব্রাদারানে ইসলাম! হাছাড়া হওয়ার আগে এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। নচেৎ অনুতপ্ত হবেন, যখন অনুতাপ কোন কাজে দেবে না।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে কল্যাণময় মৌসমগুলিকে কাজে লাগানোর তওফীক দেন এবং তাতে তাঁর আনুগত্য ও সুন্দরভাবে ইবাদত করার শক্তি দেন। আমীন।

কুরবানীর বিধান

মূলতঃ কুরবানী জীবিত মুসলিমদের জন্য বিধেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতেন। বলা বাহুল্য, লোকেদের ধারণা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির নামে বিশেষ কুরবানীর কথার কোন ভিত্তি নেই। পরন্তু মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী তিন শ্রেণীর ঃ-

(ক) জীবিত ব্যক্তির অনুগামী রূপে তার তরফ থেকে কুরবানী করা। যেমন এক ব্যক্তি নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিল এবং তাতে তার উদ্দেশ্য হল তার পরিবারের জীবিত-মৃত সকলেই। এমনটা করা বৈধ। এর ভিত্তি হল মহানবী ﷺ-এর কুরবানী। তিনি নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী যবেহ করেছেন। আর তাঁর পরিবারের অনেকেই ইতিপূর্বে মারা গেছেন।

(খ) মৃত ব্যক্তির অসিয়ত অনুযায়ী তা কার্যকর করতে কুরবানী করা। সে জীবিতাবস্থায় অসিয়ত করে গেছে, তার পক্ষ থেকে প্রত্যে বছর কুরবানী করতে হবে। সুতরাং তা করা ওয়াজেব। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

(فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة: ١٨١

"অতঃপর এ (অসিয়তের বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮১)

(গ) জীবিতদের সাথে না দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য সাদকা স্বরূপ পৃথক কুরবানী করা। এমনটা করা বৈধ। হাম্বলী ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন যে, তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছবে এবং তার দ্বারা উপকৃত হবে; যেমন তার তরফ থেকে সাদকা করলে পৌঁছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথক কুরবানী করা সুন্নত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বিশেষ করে তাঁর কোন মৃত আত্মীয়ের জন্য কুরবানী

করেননি। সুতরাং তিনি তাঁর চাচা হামযার জন্য পৃথক কুরবানী করেননি। অথচ তিনি ছিলেন তাঁর কাছে অতি সম্মানীয় নিকটাত্মীয়দের একজন। তিনি নিজ সন্তানদের পক্ষ থেকেও পৃথক কুরবানী করেননি, যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেছিলেন। আর তাঁরা ছিলেন, বিবাহিত তিনজন কন্যা ও তিনজন শিশুপুত্র। তিনি তাঁর স্ত্রী খাদীজার পক্ষ থেকেও পৃথক কুরবানী করেননি। অথচ তিনি ছিলেন প্রিয়তমা স্ত্রীদের অন্যতম। তাঁর যুগের কোন সাহাবী কর্তৃকও এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি কোন মৃত আত্মীয়ের পক্ষ থেকে পৃথক কুরবানী করেছেন।

আমরা মনে করি এটাও ভুল আচরণ যে, কিছু লোক তাদের কেউ মারা গেলে মরার প্রথম বছর কুরবানী দেয় এবং সেটাকে কবরের কুরবানী বলে। আর ধারণা করে তার সওয়াবে অন্য কারো শরীক হওয়া বৈধ নয়। অথবা তাদের মৃতদের পক্ষ থেকে সাদকা স্বরূপ অথবা অসিয়ত পালন স্বরূপ কুরবানী দেয় এবং নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের পক্ষ থেকে দেয় না। কিন্তু যদি তারা জানত যে, মুসলিম যখন নিজের মাল থেকে নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কুবানী দিলে তার জীবিত-মৃত সকল আত্মীয় সওয়াবে শরীক হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই তা বাদ দিয়ে তারা তাদের ঐ ভুল আচরণ করত না।

কুরবানী দেওয়ার নিয়ত হলে যা করা নিষেধ

চাঁদ দেখার ফলে অথবা যুলক্বা'দার ৩০ দিন পূর্ণ হওয়ার ফলে যুলহজ্জ মাস প্রবেশ করলে এবং কুরবানী দেওয়ার নিয়ত থাকলে কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর দিন কুরবানী যবেহ করার আগে পর্যন্ত নিজের নখ, চুল, মরা চামড়া ইত্যাদি কাটা হারাম। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা যুলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ (কাটা) হতে বিরত থাকে।" অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, "সে যেন তার (মরা বা ফাটা) চর্মাদির কিছুও স্পর্শ না করে।" (মুসলিম ৫২৩২, ৫২৩৪নং)

মাস ঢোকার ২/১ দিন পরে কুরবানীর নিয়ত হলে নিয়ত হওয়ার পর থেকে আর কাটবে না। তার আগে কেটে থাকলে গোনাহ হবে না।

এই নিষেধের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, যেহেতু কুরবানীদাতা হাজীর কিছু কাজে অংশগ্রহণ করে, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে, সেহেতু সে ইহরামের কিছু বৈশিষ্ট্যে শামিল হয়ে নখ-চুল ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত হয়।

এই কারণেই কুরবানীদাতার পরিবারের লোকেরা উক্ত নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। তারা নিজেদের নখ-চুল ইত্যাদি কাটতে পারে। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে"। তিনি বলেননি যে, "তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে অথবা যার তরফ থেকে কুরবানী করা হবে।" আর যেহেতু নবী ﷺ নিজ পরিবারের তরফ থেকে কুরবানী দিতেন, অথচ তাঁদেরকে নখ-চুল কাটতে নিষেধ করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন কুরবানীদাতা সে নিষেধ অমান্য ক'রে নিজ নখ, চুল বা চামড়া ইত্যাদি কেটে থাকে, তাহলে তার উচিত আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং পুনর্বার সে কাজ না করা। তার জন্য কোন কাফ্ফারা নেই এবং তার কুরবানী দিতেও বাধা নেই---যেমন অনেকে তা মনে করে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ ভুলে গিয়ে অথবা না জেনে কেটে ফেলে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে চুল বা নখ পড়ে যায়, তাহলে গোনাহ হবে না। যেমন তা কাটা জরুরী হলে; যেমন নখ ভেঙ্গে গিয়ে কষ্ট পেলে অথবা ক্ষত হওয়ার ফলে চিকিৎসার জন্য চুল কাটতে হলে, তাতেও দোষ হবে না।

ঈদুল আযহার বিধান ও কিছু আদব

সুপ্রিয় পাঠক! ইসলামের সালাম দিয়ে আপনাকে অভিবাদন জানাই ও বলি, 'আস্সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।' আর মুবারক ঈদুল আযহার আগাম মুবারকবাদ জানাই এবং বলি, 'তাক্বাবালাল্লাহু মিন্না অমিন্ক্।' আশা করি আপনি আমাদের এই পত্রখানি সাদরে গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তার দ্বারা আপনাকে এবং প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক মুসলিমকে উপকৃত করুন।

ভাই মুসলিম! আমাদের জীবনের সকল ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করাতে রয়েছে শুধু মঙ্গলই মঙ্গল। আর তাঁর বিরোধিতা ও অবাধ্যাচরণ করাতে রয়েছে শুধু অমঙ্গলই অমঙ্গল। তাই আমাদের চাই যে, আপনাকে এমন কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিই, যা মুবারক ঈদের রাতে ও দিনে এবং তাশরীকের দিনগুলিতে বলা বা করা উত্তম। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ-

১। তাকবীর ঃ আরাফার দিনের ফজর থেকে তাশরীকের শেষ দিন ১৩ তারীখের আসর পর্যন্ত 'তকবীর' পাঠ করা বিধেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)

"তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্র কর।" (বাক্বারাহ ঃ ২০৩)

তকবীরের শব্দাবলী এই, 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্দ।'

মহান আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করতে এবং তাঁর ইবাদত ও শুকরিয়া প্রকাশ করতে পুরুষদের জন্য এই তকবীর মসজিদে, বাজারে, ঘরে, ফরয নামাযের পশ্চাতে উচ্চ স্বরে পাঠ করা সুন্নত।

২। গোসল করা, পুরুষদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, সুন্দর পোশাক পরা ঃ অবশ্য তাতে যেন অপচয় না হয় এবং গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা না হয়, দাঁড়ি চাঁছা বা ছাঁটা না হয়। কারণ এ সব হারাম।

মহিলার জন্য পর্দার সাথে সুগন্ধি ব্যবহার না ক'রে ঈদগাহে যাওয়া বিধেয়। তাদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা আল্লাহর আনুগত্য ও নামাযের জন্য যাবে অথচ পর-পুরুষদের সামনে বেপর্দা হয়ে ও সেন্ট ব্যবহার ক'রে তাঁর অবাধ্যাচরণ করবে।

৩। সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া ঃ সুন্নত হল ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় করা। অবশ্য বৃষ্টি, ঠান্ডা ইত্যাদির ওযর থাকলে মসজিদে আদায় করা যায়। যেহেতু নবী ﷺ তা করেছেন।

৪। মুসলিমদের জামাআতে নামায আদায় করা ও খতীবের খুতবা শোনা ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর মতো সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ ঈদের নামায 'ওয়াজেব' হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

"সুতরাং নামায পড় তোমার প্রতিপালকের জন্য এবং কুরবানী কর।" (সূরা কাওষার)

অতএব বিনা ওযরে তা বর্জন করা যাবে না। মহিলারাও পুরুষদের জামাআতে নামায পড়তে আদিষ্ট। তবে ঋতুমতী মহিলারা ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করবে। তারা খুতবার দুআতে 'আমীন' বলবে।

৫। আপনি যে পথ ধরে ঈদগাহ গেছেন, সে পথ ছাড়া অন্য পথ ধরে বাসায় ফেরা সুন্নত। নবী ﷺ এরূপ করেছেন।

৬। ঈদের মুবারকবাদ দেওয়া উত্তম। যেহেতু সাহাবা ﷺগণ তা করেছেন।

৭। কুরবানী যবেহ ঃ আর তা হবে ঈদের নামাযের পরে। যেহেতু নবী ﷺ নামাযের পর বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন তার পরিবর্তে আরেকটি কুরবানী যবেহ করে। আর যে এখনও যবেহ করেনি, সে যেন যবেহ করে।" (বুখারী ৫৫০০, মুসলিম ৫১৭৭নং)

কুরবানী যবেহ করার সময় চার দিন ঃ কুরবানীর দিন (১০ তারীখ) এবং তাশরীকের তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ তারীখ)। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "তাশরীকের দিনসমূহের সবগুলিই যবেহর দিন।" (সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪৭৬নং)

৮। কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া ঃ নবী ﷺ কুরবানীর দিন সকালে না খেয়ে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে কুরবানীর গোশ্ত খেতেন। (আহমাদ ২২৯৮৩নং)

৯। কুরবানীর গোশ্ত গরীবদেরকেও খাওয়ান। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (٣٦) سورة الحج

"অতঃপর যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে।" (হাজ্জ ঃ ৩৬)

এই দিনগুলিতে বহু লোকে বহুবিধ ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়। আপনি সতর্ক হন, যাতে আপনিও তার শিকার না হন। যেমন ঃ-

সমস্বরে জামাআতী তকবীর পাঠ অথবা একজনের পাঠ করার পর তার পশ্চাতে অনেকের পাঠ।

যবেহর পূর্বে কুরবানীরদাতার নখ-চুল বা চামড়া কাটা।

ঈদের খুশীতে হারাম কিছু করা, হারাম খেলা করা, ছবি দেখা, গান শোনা, যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামিশা ইত্যাদি।

অপ্রয়োজনে পানভোজন, লেবাস-পোশাক ও প্রসাধনে অপচয় ও অপব্যয় করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام :١٤١

"অপচয় করো না। কারণ, তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (আন্আম ঃ ১৪১)

পরিশেষে বলি, এই দিনগুলিতে বিভিন্ন সৎকর্ম করতে ভুলবেন না, যেমন আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও ঘৃণা বর্জন করা, সেসব থেকে হৃদয় পরিষ্কার করা, গরীব-মিসকীন ও এতীম-বিধবাদের সাহায্য করা এবং তাদের মনেও খুশীর ফুল ফুটাতে চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে সেই কাজের তওফীক দেন, যা তিনি ভালোবাসেন ও যাতে তিনি তুষ্ট হন, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন এবং আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করেন, যারা যুলহজ্জের এই দিনগুলিতে কেবল তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.